প্রাক্ কথন

কাগজে কলমে বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরেরও বেশী। এই হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে সেই যুগ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বাঙালীর আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে। মধ্যযুগীয় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালীর ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। ইতিহাসের তিন যুগ বিভাগের পরেও বাঙালীর ইতিহাসে উনিশ শতকের পৃথক একটি আবেদন রয়েছে। এই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার যোগ্যতা রাখে। প্রথম বিশ্বের নাগরিক ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষ ক্রমশ আত্মসচেতন হয়। উনিশ শতকের শেষে বাঙালী ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠে। শুধু সচেতনতাই নয় — প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালী পৃথিবীর ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি পায়। বাঙালীর এই চরম উন্নতি প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলের — 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow'— বক্তব্যে বাঙালীর চিন্তা জগতে দূরদর্শিতার কথা স্বীকৃত। এই দূরদর্শিতা সম্ভব হয়েছে যুগ চিন্তানায়কগণের উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনার প্রভাবে। বাঙালী কী করে সুখী ও সমৃদ্ধ হয় — এই বিষয়টি ছিল যুগ চিন্তানায়কগণের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সফল করতে দেশীয় ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ করার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। কী করে জাতীয় জীবনের মানোন্নয়ন করা যায় সেই ভাবনা সবসময় যুগ চিন্তানাকগণের মনে বিরাজ করত। তাই এখানে স্বদেশ ভাবনা বলতে স্বদেশের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরণের উদ্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই স্বদেশ ভাবনার বিশেষ উপস্থিতির জন্যই উনিশ শতককে আলাদা করে আলোচনা করা যায়। সেকারণে উনিশ শতক বাঙালীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। এই শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

স্নাতকোত্তরে পড়ার সময় বাঙালীর এরকম গৌরবময় শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। পরে বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড: মঞ্জুলা বেরার সঙ্গে কথা বললে তিনি আমাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং এই কর্মপাগল অধ্যাপিকা তাঁর নিরলস তত্ত্বাবধানে আমার এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়।

এ কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই গবেষণার কাজকে সফল করতে আমার বাবা সজনীকান্ত রায়, মা জ্যোৎস্না রায়, স্ত্রী মনোলীনা রায় (মায়া), ভাই দিলীপ, বোন শিবানী ও হিমানী আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছে। পরিশেষে যেসব বিশিষ্ট গুণীজনের পরামর্শ আমার কাজের পথকে সুগম করেছে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাঁকুড়া

২১ নভেম্বর ২০০৬

নরেন্দ্রনাথ রায়